সুস্বাস্থ্যে কাটুক কিশোরীকাল

নাসরীন জাহান লিপি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পে দেখিয়েছিলেন, কিশোর বয়সের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। এই বয়সটাকে বয়ঃসন্ধিকাল, কৈশোর– যত রকমের গালভরা নাম দেই না কেনো, ভুক্তভোগীমাত্র জানেন, এ আসলে 'বালাই' ছাড়া কিছু না। শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী সময়ের এই বয়সে আধো-আধো কথা যেমন 'হ্যাংলামি' বা অস্বাভাবিক মনে হয়, তেমনি পাকা কথা 'জ্যাঠামি' বা বেশি পাকনা হিসেবে গণ্য হয়। হ্যাংলামি আর জ্যাঠামি'র প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক যে প্রতিক্রিয়া জোটে, তা এ বয়সিদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ বয়সিদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবার সুযোগ কৈ? শরীরের নিত্য নতুন পরিবর্তন যেন কেবলি 'অঘটন'।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, মানুষের জীবনের ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময়টাই হলো কৈশোর। একটি মেয়ের জীবনে এই সময়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং পরিবর্তনের। এই সময়েই অবয়ব বদলে সে ক্রমশঃ হয়ে উঠতে থাকে তরুণী। কিশোরীর স্বাস্থ্য বিষয়টি কেনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা শিশুদের চেয়ে ভিন্ন। কারণ এই সময়ে তাদের শরীরে হরমোনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। উচ্চতা বৃদ্ধি, স্তনের বিকাশের পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা–ঋতুস্রাব বা পিরিয়ড শুরু হয়। হরমোনের ওঠানামার কারণে মেজাজের পরিবর্তন (Mood swings), আত্মপরিচয় সংকট এবং মানসিক চাপ দেখা যায়। দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধির কারণে এই সময়ে আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং প্রোটিনের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ কিশোরী (১৫-১৯ বছর বয়সি) মা হচ্ছে। আইনগত কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের হার এখনো দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানে। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে এখনো প্রায় ৫১শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছর বয়সের আগে। বাল্যবিয়ের সরাসরি প্রভাব পড়ে কিশোরীর প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর। কিশোরীদের শরীর পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত হওয়ার আগে গর্ভধারণ তাদের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। অল্প বয়সে গর্ভধারণের ফলে মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় দ্বিগুণ থাকে। অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভধারণের কারণে জটিলতা তৈরি হয়ে হাজারো কিশোরী অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। তাই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা জরুরি।

পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে প্রায় ৪২শতাংশ থেকে ৫০শতাংশ কিশোরী রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। এর প্রধান কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, কৃমির সংক্রমণ এবং ঋতুস্রাবের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ। পিরিয়ড একটি স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া হলেও গ্রামীণ ও শহরতলীর অনেক কিশোরীর কাছে এটি এখনো এক ধরনের ট্যাবু বা লোকলজ্জার বিষয়। ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রায় ৬০শতাংশ কিশোরী স্কুলে ঋতুস্রাবকালীন অনুপস্থিত থাকে অন্তত ১৩ দিন। জাতীয় হাইজিন বেসলাইন সার্ভে অনুযায়ী, বাংলাদেশে মাত্র ৩৬ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ কিশোরী পিরিয়ডের সময় স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করে। বাকিরা এখনো পুরনো কাপড় বা নোংরা ন্যাকড়া ব্যবহার করে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অপরিচ্ছন্নতার কারণে বহু কিশোরী প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণে (RTI) ভোগে, যা পরবর্তীতে বন্ধ্যাত্বেরও কারণ হতে পারে। অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধির কারণে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে।

কিশোরী স্বাস্থ্যকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এই পরিবর্তনের সময়টাতে কিশোরীরা কতটুকু স্বাস্থ্যসেবা বা সচেতনতা পাচ্ছে? কিশোরী স্বাস্থ্যের বর্তমান চিত্র ও পরিসংখ্যান বিবেচনা যদি করি, তাহলে দেখব বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ কিশোর-কিশোরী। বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ (BDHS) এবং ইউনিসেফের বিভিন্ন সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে কিশোরী স্বাস্থ্যের কিছু চমকপ্রদ ও উদ্বেগজনক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, আমাদের দেশে এখনো বহু কিশোরী অপুষ্টির শিকার। বিশেষ করে রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া কিশোরীদের মধ্যে এক নীরব মহামারি। অ্যানিমিয়ার কারণে কিশোরীরা দুর্বল হয়ে পড়ে, মনোযোগ কমে যায়, শিক্ষাজীবনে প্রভাব পড়ে। ভবিষ্যতে মাতৃত্বের সময়ও জটিলতা তৈরি হতে পারে। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কিশোরীদের সঠিক স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বড়ো সমস্যা আছে। প্রথম সমস্যা বলা যায় ট্যাবু এবং লোকলজ্জা। পিরিয়ড বা প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে মা-বাবার সাথেও কিশোরীরা খোলামেলা কথা বলতে পারে না। ফলে অনেক সমস্যা তারা লুকিয়ে রাখে। পিরিয়ড হাইজিন বা সুষম খাবার নিয়ে কিশোরীদের নিজস্ব ও পারিবারিক সচেতনতা খুবই কম। আর্থিক অসচ্ছলতাও আরেকটি বড় অন্তরায়। স্যানিটারি প্যাডের চড়া দাম অনেক দরিদ্র পরিবারের কিশোরীদের জন্য নাগালের বাইরে। সব এলাকায় কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (Adolescent Friendly Health Services) নেই। যেখানে আছে, সেখানেও সংকোচের কারণে কিশোরীরা যেতে চায় না। কিশোরীদের একটি সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে আমাদের বেশ কিছু স্তরে কাজ করতে হবে। পুষ্টি নিশ্চিতকরণ হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কাজ। কিশোরীদের খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত আয়রন ও ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার রাখতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিশোরীদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ডিম, মাছ, মাংস, শাকসবজি, ফলমূল ও দুধজাত খাবার থাকা জরুরি। স্কুলভিত্তিক পুষ্টি কর্মসূচি এই সমস্যা কমাতে কার্যকর হতে পারে। সরকারিভাবে স্কুলগুলোতে আয়রন-ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট বিতরণের কর্মসূচি আরও জোরদার করতে হবে। স্কুলে পিরিয়ড নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা যায়। কম মূল্যে বা বিনামূল্যে স্যানিটারি প্যাড বিতরণের ব্যবস্থা করা হলে দারুণ হবে। সব দায়িত্ব স্কুল পালন করলে তো হবে না। পরিবারের মা এবং নারী সদস্যদের এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। কৈশোরে বিষণ্নতা এবং হীনমন্যতা খুব সাধারণ বিষয়। তাই পরিবারে কিশোরীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। প্রয়োজনে কাউন্সিলিং বা মানসিক চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

কিশোরী মেয়েদের স্বাস্থ্যসেবা একটি দেশের ভবিষ্যৎ মানবসম্পদ গঠনের অন্যতম ভিত্তি। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তনের এই সংবেদনশীল সময়ে সঠিক যত্ন, তথ্য ও সহায়তা না পেলে তা দীর্ঘমেয়াদে ব্যক্তি ও সমাজ, উভয়ের উপর নেতিবাচক

প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি এখনও নানা চ্যালেঞ্জে ঘেরা, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ বিষয়ে সচেতনতা ও উদ্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কিশোরী স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। দেশের বিভিন্ন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কিশোর-কিশোরীদের জন্য আলাদা কর্নার করা হয়েছে। কিশোরীরা যেন যেকোনো শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় পরামর্শ পেতে পারে, সেজন্য হেল্পলাইন (যেমন: ১০৯ বা ৩৩৩) চালু আছে। স্কুল পর্যায়ে সচেতনতা তৈরিতে অনেক স্কুলে এখন মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশরুম এবং প্যাড ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করা হচ্ছে।

কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য আরও বেশি অবহেলিত, প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। এই বয়সে আত্মসম্মানবোধ তৈরি হয়, সামাজিক চাপ বাড়ে- পরীক্ষার চাপ, পারিবারিক সমস্যা, সম্পর্কের জটিলতা দেখা দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীদের অসুস্থতার একটি বড়ো অংশ মানসিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত। বাংলাদেশে কিশোরীদের মধ্যে উদ্বেগ, হতাশা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এখনও সীমিত। সমাধানের জন্য প্রয়োজন স্কুলে কাউন্সেলিং ব্যবস্থা, পরিবারে সহানুভূতিশীল পরিবেশ, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। অনেক কিশোরী যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য পায় না। ফলে ভুল ধারণা তৈরি হয়, অনিরাপদ আচরণ বাড়ে, যৌন সহিংসতার শিকার হলেও সাহায্য চাইতে পারে না। সমগ্রিক যৌনশিক্ষা (Comprehensive Sexuality Education) কিশোরীদের নিজেদের শরীর সম্পর্কে সচেতন করে এবং সুরক্ষিত থাকতে সাহায্য করে। বাংলাদেশে এ বিষয়ে এখনও সামাজিক বাধা রয়েছে, তবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশাধিকারেও পার্থক্য রয়েছে। গ্রামীণ কিশোরীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে সংকোচ বোধ করে। নারী চিকিৎসকের অভাব সেখানে। পরিবার থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার অনুমতিমেলে না, কেননা অনেক ক্ষেত্রেই কিশোরীদের স্বাস্থ্য সমস্যা গুরুত্ব পায় না। ফলে তারা চিকিৎসা না নিয়ে সমস্যাকে সহ্য করে।

আজকের কিশোরীই আগামী দিনের মা। তাই তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিনিয়োগ করা মানে একটি সুস্থ ও সবল জাতি গঠনে বিনিয়োগ করা। বাংলাদেশ সরকার কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যেমন কিশোর-কিশোরী বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম, আয়রন-ফোলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট বিতরণ কর্মসূচি। সরকারের লক্ষ্য হলো পর্যায়ক্রমে দেশের সকল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রকে 'কৈশোরবান্ধব' হিসেবে গড়ে তোলা, যেখানে কিশোরীরা গোপনীয়তা বজায় রেখে প্রজনন স্বাস্থ্য ও মানসিক সমস্যার পরামর্শ নিতে পারে। বর্তমানে কিশোরীরা মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য পেতে পারে। বিভিন্ন অ্যাপ ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গোপনীয়ভাবে পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ, হেল্পলাইন ১০৯ ও ১০৯৮ এর মাধ্যমে জরুরি সহায়তা পাচ্ছে। তবে ভুল তথ্যের ঝুঁকিও রয়েছে, তাই নির্ভরযোগ্য উৎস নিশ্চিত করা জরুরি। এর জন্য কিশোরীদের অনলাইন স্বাক্ষরতা গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা মানে একটি সুস্থ, শিক্ষিত ও সক্ষম প্রজন্ম গড়ে তোলা। পুষ্টি, মানসিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য–সবকিছু মিলিয়ে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। শুধু ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেই হবে না, সমাজ থেকে দূর করতে হবে পিরিয়ড বা প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে থাকা কুসংস্কার ও জড়তা। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র–সবাই মিলে এক হয়ে কাজ করলেই আমরা আমাদের কিশোরীদের জন্য একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পৃথিবী গড়ে তুলতে পারব। স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তৃণমূল পর্যায়ে কিশোরী স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে আগামী দিনে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সূচকে বড় পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা যায়।

#

লেখক: উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার